প্রাচীন বাংলার ইতিহাস
History of Ancient Bengal

১

ভূমিকা
Introduction

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ প্রায় অর্ধশত বছর অতিক্রম করেছে। তবে চার হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে অবিভক্ত বাংলার রাজনীতি, সমাজ ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস প্রাচীন ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির শেকড় অনুসন্ধান করতে গেলে আমাদের কমপক্ষে চার হাজার বছর পেছনে ফিরতে হয়। বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজগুলো ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্রের যুগের (৭০০-২০০ খ্রি.পূ.) ইতিহাস প্রকাশ করে। অন্যদিকে বাংলাদেশের কয়েকটি অঞ্চলে সম্প্রতি প্রস্তর-যুগের নিদর্শনও আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাচীন বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে লৌহযুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। সুতরাং আজকের বাংলাদেশ, অতীতে যা 'বাংলা' 'বঙ্গ' 'গৌড়' ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল তার একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। উন্নত সভ্যতা, ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি এবং সমৃদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা এ জনপদকে গৌরবান্বিত করেছে। বর্তমান ইউনিটে প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশ, প্রাগিতিহাস থেকে প্রাচীন বাংলার জনপদ, মৌর্য, গুপ্ত, শুঙ্গ, ও কুষাণ আমলের বাংলা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া স্বাধীন বঙ্গ রাজ্য ও গৌড়ের বিবরণ এবং পাল ও সেন শাসনকালের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় দুই সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ১.১ : প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশ
পাঠ- ১.২ : প্রাগিতিহাস থেকে প্রাচীন বাংলার জনপদ
পাঠ- ১.৩ : মৌর্য, গুপ্ত, শুঙ্গ ও কুষাণ আমল
পাঠ- ১.৪ : স্বাধীন বঙ্গ রাজ্য, গৌড় ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা
পাঠ- ১.৫ : পাল ও সেন শাসন

মুখ্য শব্দ	প্রাচীন বাংলা, ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাচীন বাংলার জনপদ, মৌর্য, গুপ্ত, শুঙ্গ, কুষাণ, স্বাধীন বঙ্গ রাজ্য, গৌড়, পাল শাসন, সেন শাসন।

পাঠ-১.১ প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশ

Geographic Location and Enviroment of Ancient Bengal

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান বর্ণনা করতে পারবেন;
- প্রাচীন বাংলার পরিবেশ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- বাংলার ইতিহাসের ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রাচীন ভারতবর্ষের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিমণ্ডল ও পরিবেশ অনেকক্ষেত্রেই ভারতের অনুরূপ। বর্তমানে রাজনৈতিক মানচিত্রে দেশটির অনেকটাই ভারতের সীমানা দ্বারা পরিবেষ্টিত। সুরমা, মেঘনা, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র বেসিনের কয়েকটি অঞ্চলের ভূমিরূপ ও স্তরবিন্যাসগত অবস্থান বিশ্লেষণ করে এ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে। এ ক্ষেত্রে বিশেষত ভূতাত্ত্বিকভাবে নিওজিন সময়কালের শেলের ভূ-রাসায়নিক গঠনসহ নানাবিধ দিক বিশ্লেষণ করা হয়।

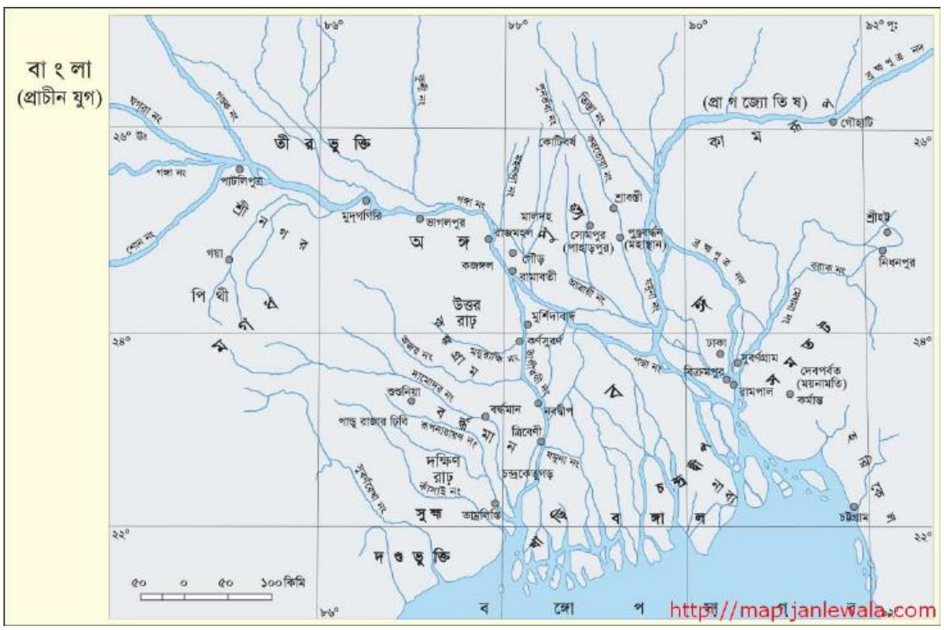

প্রাচীন বাংলার মানচিত্র

অনেক ইতিহাসবিদ, ভূগোলবিদ ও প্রত্নতাত্ত্বিকের মাঝে তথ্যগত ভুল ধারণা প্রচলিত ছিল যে, বাংলাদেশের ইতিহাস মূলত সমতল ভূমিতে বিকশিত হওয়া রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে, বাংলাদেশের ভূমিরূপের গঠন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনেক প্রাচীন। বাংলাদেশের বেশিরভাগ স্থান নদীতীরবর্তী পলল দিয়ে গঠিত হলেও লাল ল্যাটেরাইটিক মাটিও এদেশের বেশ কিছু স্থানে পাওয়া গেছে। উদাহরণ হিসেবে মধুপুর গড় কিংবা বরেন্দ্রভূমির কথা বলা যায়। এ সকল ভূমিতে বিশেষত বরেন্দ্রভূমি বা মধুপুর অঞ্চলের মাটিতে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও প্রাচীন সভ্যতার বৈশিষ্ট্যাবলি পাওয়া গেছে।

বিষয়টি আরো বিস্তৃত পরিসরে বোঝার জন্য পূর্ব বাংলার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বিস্তৃত সমতল ভূমির সাথে তুলনা করা যেতে পারে। ভৌগোলিকভাবে বাংলা অঞ্চলের পশ্চিম দিকে ছোট নাগপুর অঞ্চল, তথাকথিত কষ্টিপাথর বা কালো ব্যাসল্ট পাথরের প্রাপ্তিস্থান রাজমহলের পাহাড়ি অঞ্চল এবং গাঙ্গেয় সমতল ভূমির একাংশ অবস্থিত। পূর্ব দিকে ত্রিপুরা, গারো ও

লুসাই পর্বতমালা এবং সীমান্তবর্তী আরাকান ইওমা অঞ্চলের নতুন ভূমি। উত্তরে নবগঠিত হিমালয় অঞ্চল, শিলং মালভূমি এবং নেপালের তরাই এলাকা; উত্তর-পূর্বে মেঘালয়ের প্রাচীন মালভূমি এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের বিশাল জলরাশি দিয়ে বঙ্গীয় অবখাত অঞ্চলটির গোড়াপত্তন ঘটে।

প্রতিবছর পশ্চিম দিকে আনুমানিক ১৫ মিটার এবং ব-দ্বীপের মধ্যভাগে ২৫ মিটার সম্প্রসারণ ঘটতে দেখা যায়। অথচ অতীতে এ সম্প্রসারণ অনেক বেশি ছিল যা প্রতিবছর প্রায় ৭৫ মিটার পর্যন্ত দেখা যেত। বঙ্গীয় অবখাতে ভূমিরূপের প্রাচীনত্যের কথা বলতে গেলে ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনায় সবার আগে মধুপুর গড় ও বরেন্দ্র ভূমির কথা বলতে হয়। এগুলো প্লাইস্টোসিন কালপর্বের পললায়নে লাল মাটির উঁচু ভূমি হিসেবে বিকশিত হয়। ভূতাত্ত্বিকদের বিশ্লেষণে এই পললায়নের সময়কাল আনুমানিক ৪০ হাজার বছর বা ততোধিক। সাংস্কৃতিক উন্নয়নের কালপর্ব বিচার করতে গেলে বিগত ৪০ হাজার বছরে অর্থাৎ প্রস্তরযুগ থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের ভৌত পরিবেশ বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। বরফ যুগের পাশাপাশি আন্তঃবরফ যুগের বরফগলা পানির মাধ্যমে সৃষ্ট ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ এদেশের জলবায়ুকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের ভূমিরূপ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সাংস্কৃতিক উন্মেষপর্ব থেকে এই অঞ্চলের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে। এই অঞ্চলের মানুষের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা অনেকাংশে এর প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় সময়ের আবর্তে ইতিহাসের যে অগ্রযাত্রা সেখানেও ভূমিরূপ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব দৃশ্যমান। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস থেকে শুরু করে পরবর্তীকালেও বিষয়টির গুরুত্ব দৃশ্যমান।

পাঠ-১.২ প্রাগিতিহাস থেকে প্রাচীন বাংলার জনপদ
Prehistory to Ancient Bengal Janapada

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের প্রাগিতিহাস সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর বিবরণ দিতে পারবেন;
- বাংলার সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের প্রাগিতিহাস

প্রাক-ইতিহাস কিংবা প্রাগিতিহাস বলতে বোঝায় ইতিহাস-পূর্ব যুগকে। সহজ ভাষায় বলতে গেলে, যে সময়ের কোনো লিখিত ইতিহাসের সূত্র নেই কিন্তু মানুষের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও বৈশিষ্ট্যসমূহের নিদর্শন পাওয়া যায় তাকে ইংরেজিতে বলা হয় Pre-history আর বাংলায় প্রাক-ইতিহাস তথা প্রাগিতিহাস। প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশের ভূমিরূপের প্রাচীনত্বের কথা চিন্তা করে বেশিরভাগ ইতিহাসবিদ মত দিয়েছেন যে, এই অঞ্চলে প্রাগিতিহাসের অস্তিত্ব নেই। পাশাপাশি এই অঞ্চলের প্রাগৈতিহাসিক মানুষের হাতিয়ার তৈরির উপযোগী উপকরণসমূহ না থাকায় তাদের যুক্তি আরও শক্তিশালী হয়েছিল। কিন্তু এই অঞ্চলের মানুষ তাদের নিজেদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পাথর-যুগের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটিয়েছিল ফসিল কাঠের সাহায্য নিয়ে।

হবিগঞ্জের চাকলাপুঞ্জী ও ময়নামতির লালমাই থেকে প্রাপ্ত ফসিল কাঠের হাতিয়ার

কুমিল্লার লালমাই ময়নামতি অঞ্চল ও হবিগঞ্জের চাকলাপুঞ্জী হতে ফসিল কাঠের হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে। ভূমিরূপের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ও বিকাশ বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের সাংস্কৃতিক নিদর্শন মূলত পাথর বা বিভিন্ন ধরনের খনিজ উপাদানের বৈশিষ্ট্য দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। বাংলাদেশের ভূমিরূপের বৈচিত্র্যের কারণে এখানে পাথর বা অনুরূপ কোনো উপাদান পাওয়া যায় না বললেই চলে। তবে এখানে প্লাইও-প্লাইস্টোসিন ভূতাত্ত্বিক কালপর্বে সৃষ্ট ধুপিটিলা সংঘে প্রচুর ফসিল বা অশ্মীভূত কাঠ পাওয়া যায়। এই কাঠগুলো অনেকাংশে পাথরের মতো শক্ত।

পাথরের বদলে ফসিল বা অশ্মীভূত কাঠের ব্যবহার বাংলাদেশে প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য বলে ধরে নেওয়া যায়। প্রথম দিকে ১৯৮৯ সালে কুমিল্লা জেলার লালমাই-ময়নামতি অঞ্চলে অধ্যাপক দিলীপ কুমার চক্রবর্তীর নেতৃত্বে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষক দল অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করে লালমাই উচ্চভূমি হতে বাংলাদেশের প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির নিদর্শন আবিষ্কার করেন। অধ্যাপক চক্রবর্তী ও তাঁর অনুসন্ধানকারী দলটি লালমাই পাহাড়ের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশের বিভিন্ন অবস্থান থেকে জীবাশ্ম-কাঠ নির্মিত বিভিন্ন প্রকারের ২৩৪টি প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নবস্তু আবিষ্কার করেন। ১৯৯৭ সালে হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাটস্থ চাকলাপুঞ্জি চা বাগানে একই ধরনের ফসিল-কাঠ

নির্মিত প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ার শনাক্ত করা হয়। প্রাগিতিহাসবিদ ও ভূ-প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, এ হাতিয়ারগুলো সম্ভবত এর প্রাপ্তিস্থানের আশে পাশে কোনো পাহাড়ের চূড়া বা ঢালে নির্মিত বা সংরক্ষিত হয়েছিল। গাঠনিক বিন্যাস, নির্মাণ প্রযুক্তি ও কলাকৌশলসহ আনুষঙ্গিক দিক বিচার করে এই অঞ্চলে প্রাপ্ত হাতিয়ারগুলোর সাথে লালমাই অঞ্চলের নিদর্শনগুলোর উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

প্রাচীন বাংলার জনপদ (Ancient Bengal Janapada)

প্রাচীনকালে বাংলা বলতে ভৌগোলিকভাবে আলাদা কোনো ভূখণ্ডকে বোঝায় না। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বিশ্লেষণ ও ঐতিহাসিক প্রমাণের তুলনামূলক পর্যালোচনা করে দেখা যায়, খ্রিস্টপূর্ব সাত শতকে বাংলা অঞ্চল অনেকগুলো জনপদে বিভক্ত ছিল। এই জনপদগুলো গড়ে ওঠার পেছনে একটা সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট ছিল। ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায়, এ সময়ে উত্তর ভারতে ব্যাপকভাবে লোহার ব্যবহারের পাশাপাশি অন্যান্য ধাতুর প্রচলন ছিল। পর্যায়ক্রমে ধাতুর আবিষ্কার এবং এগুলোর উপযুক্ত ব্যবহার মানুষের জীবন-যাত্রাকে বদলে দিতে শুরু করে এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবন অনেকটা নিরাপদ ও গতিশীল হয়ে ওঠে।

পাথরের হাতিয়ারের বদলে এ সময়ে মানুষ ধাতব অস্ত্র এবং কৃষি উপকরণ তৈরি ও ব্যবহার শুরু করে। ধাতব হাতিয়ারের মাধ্যমে কৃষিকাজ করায় তাদের পরিশ্রম কমে গিয়ে চাষাবাদ যেমন তুলনামূলকভাবে সহজ হয়, তেমনি ফসলের উৎপাদন বহুগুণ বেড়ে যায়। এর বাইরে তারা নিজেদের চাহিদার কথা চিন্তা করে অনেক পতিত জমি কৃষিকাজের আওতায় নিয়ে আসে। কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে তারা উদ্বৃত্ত খাদ্য মজুদ করে। সঞ্চিত সম্পদ তাদের বাণিজ্য বিকাশের পথ প্রশস্ত করে। অর্জিত এই উন্নয়ন তাদের জীবনে এনেছিল এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এ পরিবর্তনের ফলেই এ অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী তাদের আর্থ-রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করে নিতে সক্ষম হয়।

প্রাচীন বাংলার ভূমিরূপের সঙ্গে মিল রেখে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাসের গোড়াপত্তন হয়েছিল বেশ কয়েকটি জনপদকে কেন্দ্র করে। প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর সাথে পরিচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে কীভাবে এ অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছিল সে সম্পর্কে অনুধাবন করা যায়। বৈদিক সাহিত্যগুলো থেকে শুরু করে আরও অনেক নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্রে এ অঞ্চলের জনপদ এবং অধিবাসীদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

উপযুক্ত গবেষণা, অনুসন্ধান ও জরিপের সংকটে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক সীমারেখায় জনপদগুলোর গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া বস্তুনিষ্ঠভাবে জানা সম্ভব হয়নি। পাশাপাশি যথাযথ ভৌগোলিক তথ্যের অভাবে জনপদগুলোর নির্দিষ্ট সীমানাও যথার্থভাবে নির্ধারণ করা যায়নি। বিশেষ করে ধারাবাহিক সূত্রের অভাবে প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর প্রকৃত অবস্থান ও বিস্তৃতি সম্পর্কে উপযুক্ত তথ্য পাওয়া যায় না। তবে সাম্প্রতিক গবেষণা ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বিশ্লেষণের মাধ্যমে খ্রিস্টপূর্ব ছয়-সাত শতক থেকে উপমহাদেশের ইতিহাসের আবর্তন কেমন ছিল সে সম্পর্কে উপযুক্ত ও নির্ভরযোগ্য তথ্য আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। বিশেষ করে গবেষকদের নিরলস প্রচেষ্টায় বিভিন্ন ধরনের বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থ প্রাপ্তি ও বিশ্লেষণের সুযোগ হয়েছে। অন্যদিকে ভারতবর্ষ থেকে শুরু করে বাংলার নানা স্থানে পরিচালিত প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও অনুসন্ধান অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কারের সুযোগ করে দিয়েছে।

আবিষ্কৃত বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থসমূহ বিশ্লেষণ এবং প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার পাশাপাশি সন্নিবিষ্ট তথ্যের যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে খ্রিস্টপূর্ব ছয়-সাত শতক সময়কালের বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ উন্মোচন সম্ভব হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যসমূহে অনেক বিষয় অস্পষ্ট থাকলেও অনুমান করে নেয়া যেতে পারে খ্রিস্টপূর্ব ছয় শতকের আগে থেকেই এ উপমহাদেশের মানুষ সংঘবদ্ধ ও সুপরিকল্পিত সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিল।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এ সময় মানুষের জীবনে এক ধরনের গতিময়তা সৃষ্টি করে। তারা এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে নানা দিক থেকে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হয়েছিল। তখন সঞ্চিত সম্পদের মালিকানা নির্ধারণ, বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের হিসাব রাখা এবং নিরাপত্তার মত বিষয়গুলো অতি জরুরি হয়ে উঠেছিল। তাদের এ ধরনের প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক ও সামরিক সংগঠন। এগুলো বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দায়িত্ব পালন করতে

থাকে। এ সময় কৃষিকাজের পাশাপাশি সামরিক ক্ষেত্রে পাথর, কাঠ প্রভৃতির বদলে উন্নত ধাতু কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে লোহার অস্ত্রের ব্যবহার শুরু হয়।

লোহার তৈরি হাতিয়ার অন্য যেকেনো হাতিয়ার অপেক্ষা শক্তিশালী হওয়ায় এ পর্যায়ে এসে তাদের সামরিক শক্তি বহুগুণে বেড়ে যায়। ক্রমবর্ধমান সামরিক শক্তি অনেক গোষ্ঠীকে সময়ের আবর্তে যুদ্ধবাজ ও দখলদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তারা নিজ শক্তিমত্তা কাজে লাগিয়ে ভূমি উন্নয়ন এবং বিশেষ করে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে উন্নত ও সমৃদ্ধ অঞ্চল দখল করে আরো সমৃদ্ধ হতে সচেষ্ট হয়। ধাতু-যুগের উন্মেষকালে যে ক্ষমতা বৃদ্ধির লড়াই শুরু হয় তা থেকে একটা পর্যায়ে এসে প্রাথমিক রাষ্ট্রচিন্তার বিকাশ ঘটে। রাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক পর্বে জনবহুল এলাকাগুলো পরিচিতি পায় ‘জনপদ’ হিসেবে। ভারতবর্ষ থেকে বিকশিত জনপদের এই ধারণাকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে প্রাচীন বাংলার ‘জনপদ’গুলো গড়ে ওঠে।

প্রাচীন বাংলার ইতিহাস পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করতে গেলে জনপদগুলোকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গেই বিবেচনা করতে হয়। তবে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস গবেষণা করতে গেলে অন্য সব অংশের মত এ জনপদের গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য লিখিত তথ্যসূত্র পাওয়া যায় না। সবথেকে বড় সমস্যা এসব জনপদের ক্ষেত্রে কোনো রাষ্ট্রীয় চরিত্র গড়ে ওঠেনি। ফলে বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত নথি বা দলিল-দস্তাবেজেরও অভাব রয়েছে।

প্রাচীন বাংলায় প্রকৃত অর্থে জনপদ না থাকলেও তার নাম অক্ষুন্ন ছিল। এসময় সেখান থেকে বিভিন্ন শাসক ভূমিদানের দলিল হিসেবে যে তাম্রশাসন কিংবা শিলালিপি জারি করেছিলেন সেগুলো রাজনৈতিক ইতিহাসের অমূল্য দলিল। এখানে সরাসরি লিপি জারিকারী রাজার নাম, উপাধি ও রাজাঙ্কের উল্লেখ লক্ষণীয়। বিভিন্ন সাহিত্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্রে জনপদ সম্পর্কিত নানাবিধ তথ্য থাকলেও এ অঞ্চলে সর্বজনস্বীকৃত নয়টি জনপদের নাম পাওয়া যায়। এগুলো হচ্ছে– বঙ্গ, রাঢ়, সমতট, হরিকেল, পুণ্ড্র, বরেন্দ্র, তাম্রলিপ্তি, চন্দ্রদ্বীপ এবং গৌড়। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বিশ্লেষণের আলোকে এই জনপদগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া সম্ভব।

সারসংক্ষেপ

প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে বাংলার মানুষ বিকাশ ঘটিয়েছিল প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির। পাথরের অনুপস্থিতিতে ফসিল কাঠ ব্যবহার করে এই সংস্কৃতি গড়ে তোলা হয়েছিল। বাংলায় রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটার আগে এখানে গড়ে উঠেছিল অনেকগুলো জনপদ। প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে বঙ্গ, রাঢ়, সমতট, হরিকেল, পুণ্ড্র, বরেন্দ্র, তাম্রলিপ্তি, চন্দ্রদ্বীপ এবং গৌড় নামের এই জনপদগুলো এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

পাঠ-১.৩ মৌর্য, গুপ্ত, শুঙ্গ ও কুষাণ আমল

Maurya, Gupta, Shunga and Kushana Period

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মৌর্য আমলের বাংলা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- শুঙ্গ ও কুষাণ যুগে বাংলা কেমন ছিল তার বিবরণ দিতে পারবেন;
- গুপ্তযুগের বাংলার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মৌর্য শাসনামলে বাংলা

মহাজনপদ যুগের শেষদিকে এসে মগধ অনেক শক্তিশালী হয়ে অন্যান্য প্রায় সকল জনপদকে দখল করে নিতে থাকে। ষোড়শ মহাজনপদের শেষদিকে এসে মগধ যখন অধিকাংশ মহাজনপদে তার নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে; তার কিছুদিন পর ৩২১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মৌর্যরা ভারতে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে মগধ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভারতের গয়া আর পাটনা জেলা নিয়ে। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, বর্তমান বাংলাদেশ পর্যন্ত এর বিস্তার ঘটেছিল। মৌর্য বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোকের (২৬৯–২৩২খ্রি.পূ.) রাজত্বকালে উত্তর বাংলার বৃহদাংশ মৌর্যদের দখলে গিয়েছিল বলে জোরালো ঐতিহাসিক অভিমত রয়েছে।

ইতিহাসবিদদের এ ধারণা নিতান্তই অমূলক নয়। মহাস্থানগড় এর নিকটবর্তী স্থানে প্রাপ্ত একটি শিলালিপির ভাষ্য হতে বাংলাদেশে মৌর্য শাসন বিস্তৃত হয়েছিল বলে ধরা হয়। এই শিলালিপিতে যদিও অশোকের নাম সরাসরি উল্লেখ নেই, তবে এই লিপির ভাষ্য বিশ্লেষণ করে 'পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তিটির' রাজধানী হিসেবে আজকের বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়কে চিহ্নিত করা হয়। পুণ্ড্রবর্ধনের তখনকার নাম ছিল 'পুণ্ড্রনগর'। অন্যদিকে অজ্ঞাতনামা গ্রিক বিবরণ *পেরিপ্লাস অব দ্যা ইরিথ্রিয়ান সী*, টলেমির ভূগোল-বর্ণনা, বিভিন্ন প্রাচীন গ্রিক এবং অন্যান্য বিবরণীতে বাংলায় মৌর্য শাসন বিস্তৃত হওয়ার ধারণা পাওয়া যায়। তবে ইতিহাসবিদদের ধারণা, স্বাধীনতা প্রিয় বাংলার মানুষ মৌর্যদের কাছে অধীনতা স্বীকার করেনি। প্রমাণ হিসেবে তারা গঙ্গা নদীর তীরে গড়ে ওঠা 'গঙ্গারিডি' নামক শহরের উল্লেখ করে থাকেন। এ তথ্যও গ্রিক লেখকদের বিবরণীতে প্রাপ্ত এবং 'গঙ্গারিডি'র অবস্থান নিয়ে অনেক মতভেদ ও যুক্তিতর্কের অবকাশ রয়েছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হলে খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দে বগুড়ার মহাস্থানগড়ে উন্নত এক সংস্কৃতির পত্তন করেছিলেন মৌর্য বংশের রাজারা। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে মহাস্থানগড়ে ধারাবাহিকভাবে মৌর্য, গুপ্ত, পাল, সেন ও মুসলিম যুগের নানা নিদর্শন আবিস্কৃত হয়েছে। তাই প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান এবং ইতিহাসের বিচারে মহাস্থানগড় অঞ্চলটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার তুলনায় অনেক পরে জন্ম নিলেও বাংলা অঞ্চলের এই সভ্যতা টিকেছিল দীর্ঘকাল।

মহাস্থানগড়ের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে করোতোয়া নদী যা এককালে অনেক বড় ছিল। বর্তমানের শীর্ণকায় এ নদীটি আজ অবধি গতি পরিবর্তন করেনি। অনেককাল ধরে টিকে থাকা জনপদটি একসময় স্বাভাবিক নিয়মে ধ্বংস হলেও পরবর্তীতে অন্য জাতি এখানে গড়ে তুলেছে বসতি। ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে উত্তর বাংলা মৌর্য রাজবংশের কাছে পরাভূত হলে মহাস্থানগড়ে একটি প্রদেশ গড়ে তোলা হয়। তখন এর নাম ছিল 'ভুক্তি'। উত্তর বাংলার এই মৌর্য প্রদেশের নামই 'পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি' ছিল বলে ইতিহাসবিদগণ মনে করেন। আজকের এই মহাস্থানগড় অঞ্চলের 'পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি'র রাজধানী ছিল পুণ্ড্রনগর। পুণ্ড্রনগর বা মূল রাজধানী শহরটি ছিল অনেকটা দেয়াল ঘেরা দুর্গের মতো।

অশোকের সময়ের প্রতিনিধিত্বশীল কোনো লিপি বাংলায় পাওয়া যায়নি যা থেকে বিশ্লেষণ করে বাংলার মৌর্য শাসনের ইতিহাস প্রমাণ করা যায়। লিখনশৈলী ও বক্তব্য বিশ্লেষণ করে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকগণ বাংলাদেশের মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত ব্রাহ্মী শিলাফলক লিপিটিকে অশোকের আমলের বা অন্তত মৌর্য আমলের বলে দাবি করেন।

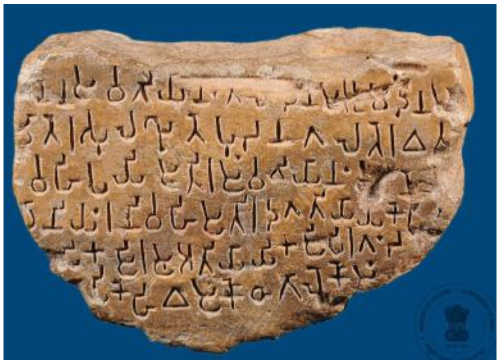

মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত ব্রাহ্মী শিলালিপি

মহাস্থানগড়ের ধ্বংসাবশেষ

লিপিতে উৎকীর্ণ তথ্যের স্বপক্ষে প্রমাণ মিলেছে মহাস্থানগড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে। একে মৌর্য কালপর্ব থেকে মুসলিম যুগ পর্যন্ত প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। এর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের বানগড়ে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে দিনাজপুর, রাজশাহী ও বগুড়ার বিভিন্ন স্থানে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব তিন শতকের দিকে বিকশিত বসতির চিহ্ন পাওয়া যায়। রাজশাহীর ফতেহ গ্রাম ও বৈগাছা থেকে আবিস্কৃত ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা, জয়পুরহাটের পাথরঘাটা এবং হলুদবিহারে আবিষ্কৃত উত্তরাঞ্চলীয় কালো চকচকে মৃৎপাত্র বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে আদি ঐতিহাসিক যুগের বসতির প্রমাণ দেয়। বিশেষ করে মহাস্থানগড় ছাড়াও এর আশেপাশে আরো আটটির মতো প্রত্নস্থান থেকে উত্তরাঞ্চলীয় কালো চকচকে মৃৎপাত্র আবিষ্কার এই অঞ্চলে আদি ঐতিহাসিক সময়কালের বসতি থাকার প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য প্রমাণকে আরো জোরদার করেছে।

বাংলাদেশের আলোচিত প্রত্নস্থান উয়ারী-বটেশ্বর থেকে সাম্প্রতিক খনন ও উপরি-পৃষ্ঠীয় সংগ্রহে প্রচুর ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গেছে। সাম্প্রতিককালে এখান থেকে একটি মুদ্রার হোর্ড বা মুদ্রায় পরিপূর্ণ মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে যা পরীক্ষাধীন। গবেষকগণ রৌপ্যমুদ্রার মধ্যে জনপদ মুদ্রা ও সাম্রাজ্যিক মুদ্রা উভয় ধরনকে চিহ্নিত করেছেন, যা থেকে এ অঞ্চলের আর্থিক সমৃদ্ধির বিষয়ে অনুমান করা যায়। পাশাপাশি আদি-ঐতিহাসিক সময়কালে বাংলাদেশের বসতিচিহ্ন বিশ্লেষণেও এই ধরনের প্রত্ননিদর্শন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রাপ্ত নিদর্শনের ভিত্তিতে 'ঐতিহ্য অন্বেষণ' নামক সংস্থাটি দাবি করেছে, এই উয়ারী-বটেশ্বর অঞ্চলেই হয়তো ইতিহাস বিখ্যাত গঙ্গারিডি বা গঙ্গারিডাই রাজ্য গড়ে উঠেছিল।

বর্তমানে বাংলাদেশের সবথেকে বড় ও প্রাচীন দুর্গনগরী হিসেবে পুণ্ড্রনগরীর ধ্বংসাবশেষকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বগুড়া শহরের প্রায় ১৩ কিমি উত্তরে অবস্থিত এই নগরীর ধ্বংসাবশেষটি নদীর সমতল থেকে আনুমানিক ৬ মিটার উঁচু প্রতিরক্ষা প্রাচীর দিয়ে চারদিকে বেষ্টিত। পূর্বদিকে প্রবাহিত করতোয়া নদী মহাস্থান দুর্গ নগরীকে প্রাকৃতিক নিরপত্তা নিশ্চিত করেছিল। উত্তর ও পশ্চিম দিকে আজ অবধি এই পরিখার চিহ্ন বেশ স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়। অন্যদিকে দক্ষিণে নির্মিত পরিখা মারাত্নকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও শনাক্ত করা গেছে।

উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিমে লক্ষ করলে দেখা যায়, প্রায় ৮ কি. এর বেশি এলাকাজুড়ে মহাস্থানগড় দুর্গনগরীর বিস্তৃতি ছিল। ঐ সময়ে নগর বিস্তারের প্রমাণ হিসেবে পুরো ৮ কি. মি এলাকা জুড়ে অগণিত ঢিবি আবিষ্কার করা হয়েছে। এই ঢিবিগুলো ঐ সময়ের মানব বসতির চিহ্ন। ঔপনিবেশিক সময়কালের অনেক পর্যটক এখানে আরো ঢিবির অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেছেন। তবে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে এই এলাকাকে পুণ্ড্রনগরীর ধ্বংসাবশেষ হিসেবে আবিষ্কার করেন স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম। পাশাপাশি এখানে প্রাপ্ত লিপিতে 'পুডনগল' বা পুণ্ড্রনগর কথাটির উল্লেখ থাকায় অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানটিকে মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত পুণ্ড্রনগরী হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন।

শুঙ্গ যুগ

মৌর্য আমলের পর বাংলার ইতিহাসে শুঙ্গদের আগমনের বিষয়টি অনুমান করা হয়। পুষ্যমিত্র শুঙ্গ, অগ্নিমিত্র এবং দেবভূতি ছিলেন এই সময়ের শক্তিশালী শাসক। এর অনতিকাল পরেই কুষাণদের আগমন ঘটে থাকতে পারে যাদের মুদ্রা প্রাচীন বাংলা থেকে পাওয়া গেছে। শুঙ্গ যুগের আবির্ভাবের সাথে সাথে মৌর্য আমলের শাসনকাঠামো থেকে শুরু করে পূর্বতন রাষ্ট্র-

নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির অবসান ঘটে। এরপর থেকে বেসরকারি মালিকানায় কারিগরি শিল্প কারখানা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক বিকাশ ঘটে। বিশেষ গিল্ড বা নিগম চালু হওয়ার পর থেকেই কারিগর বা বণিকগণ তাঁদের পণ্যে সিলমোহর যুক্ত করে বাজারজাত করা শুরু করেছিলেন। তবে তাদের ব্যবহৃত লিপিতে কিছুটা বৈচিত্র্য লক্ষ করা গেছে।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রাপ্ত শুঙ্গ টেরাকোটা

অন্যদিকে ব্রাহ্মী-খরোষ্ঠী মিশ্রিত লিপিযুক্ত পোড়ামাটির সিল পাওয়া গেছে হাদিপুর, চন্দ্রকেতুগড় ও বানগড় বা প্রাচীন কোটিবর্ষ এলাকা থেকে। এগুলোর বেশিরভাগই সিলের উপরে উৎকীর্ণ লিপি। এগুলো ব্যক্তিগত, সরকারি, বাণিজ্যিক, ধর্মীয়, শৈল্পিক বা সাহিত্যিক ইত্যাদি বিচিত্র ধরনের তথ্য ধারণ করে। বিশেষ করে এর থেকে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্যপ্রমাণ পাওয়া না গেলেও ঐ সময়ের শাসনকাঠামো ও শাসনতন্ত্র সম্পর্কে একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রথম বা দ্বিতীয় শতকের একটি সিল থেকে তখনকার গণরাজ্যের তথ্য জানা যায়।

কুষাণ যুগ

ইতিহাস বিশ্লেষণ করে ধারণা করা হয়, উমহাদেশে প্রথম স্বর্ণমুদ্রা চালু করেন কুষাণ সম্রাটগণ যা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে ধরা যায়। কুষাণ সম্রাট বীম কদফিসেসই সম্ভবত সর্বপ্রথম স্বর্ণমুদ্রা প্রবর্তন করেন যেখানে মুদ্রার উপরিপৃষ্ঠে বেদিতে যজ্ঞরত রাজার প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ রয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মনে করেন, এই বিশেষ প্রতিকৃতি পার্থিয়ান রাজা গোটার্জেসের স্বর্ণমুদ্রার নকশা দ্বারা প্রভাবিত। তবে পরবর্তীকালের কুষাণ সম্রাট কনিষ্ক ও হুবিষ্ক তাদের স্বর্ণমুদ্রায় বিভিন্ন ধরনের নকশা ও প্রতীক ব্যবহার করেছেন যেগুলো আলাদাভাবে বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

কুষাণ স্বর্ণমুদ্রা

ভারতের অন্যান্য স্থানে কুষাণ শাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট মুদ্রা আর বাংলায় প্রাপ্ত কুষাণ মুদ্রার অবস্থানগত পার্থক্য রয়েছে। বিশেষত, বাংলা সরাসরি কুষাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তবুও বাংলা থেকে অগণিত কুষাণ-মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলোর প্রকৃত গুরুত্ব অনুধাবন করা কষ্টকর। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকগণ ধারণা করেন, খুব সম্ভবত এই মুদ্রাগুলো বাংলায় এসেছে বাণিজ্যিক কারণে বিভিন্ন বণিকের হাত ধরে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বাংলার বিভিন্ন প্রত্নস্থান থেকে কুষাণ সম্রাট কনিষ্ক, হুবিষ্ক ছাড়াও মহানাদ কুষাণ, প্রথম বাসুদেব ও দ্বিতীয় বাসুদেবের স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কার করেছেন।

এই মুদ্রাগুলোর প্রাপ্তি থেকে বাংলাদেশে সরাসরি কুষাণ শাসনের কথা চিহ্নিত করা না গেলেও ধারণা করা হয়, বাংলাদেশের রাজনৈতিক কাঠামোতে কুষাণদের হস্তক্ষেপ থাকতে পারে। লিপিমালা ও আনুসাঙ্গিক তথ্যের অপ্রতুলতায় মৌর্যযুগ পরবর্তীকালের বাংলাদেশের ইতিহাস অনেকটাই ধোঁয়াশাচ্ছন্ন। বিশেষ করে একটিমাত্র শুঙ্গানুকৃতির টেরাকোটা আর কিছু কুষাণ মুদ্রার সূত্র ধরে এই সময়ের ইতিহাস নির্মাণ অনেক কঠিন।

গুপ্ত যুগ

তথ্যপ্রমাণ থেকে জানা যায়, খ্রিস্টীয় প্রায় ৪ শতকের শুরুতে উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রথম গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মগধ বা বরেন্দ্রের অধিপতি ছিলেন গুপ্তদের আদিপুরুষ শ্রীগুপ্ত। এরপর তার পুত্র ঘটোৎকোচ গুপ্ত ততটা সুবিধা করতে না পারলেও শাসক হিসেবে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন গুপ্ত বংশের সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (খ্রিস্ট্রীয় ৩২০-৩৪০ অব্দ)। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের হাত ধরে গুপ্ত শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর একে একে সমুদ্রগুপ্ত (খ্রিস্ট্রীয় ৩৪০-৩৮০ অব্দ), দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য (খ্রিস্ট্রীয় ৩৮০-৪১৫ অব্দ), ১ম কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য (খ্রিস্ট্রীয় ৪২৫-৪৫৫ অব্দ), স্কন্ধগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের (খ্রিস্ট্রীয় ৪৫৫-৪৬৭ অব্দ) প্রবল পরাক্রান্ত শাসন লক্ষ করা যায়। তবে পরবর্তীকালের গুপ্ত শাসকগণ অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছিলেন। তারপর হুনদের আক্রমণের মধ্য দিয়ে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে ।

বাংলার প্রাচীন যুগের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে গুপ্ত যুগেরই সর্বোচ্চ লিপিতাত্ত্বিক সূত্র পাওয়া যায়। বেশিরভাগ তামার পাতে লিখিত এইসব লিপিকে বলা হয় 'তাম্রশাসন'। এর পাশাপাশি প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো এই যুগের ইতিহাস রচনাকে অনেক সহজ, প্রাঞ্জল, গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিযুক্ত করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। সুসুনিয়া গিরিলিপি, সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি, প্রথম কুমারগুপ্তের বৈগ্রাম, ধনাইদহ, দামোদরপুর, সুলতানপুর ও জগদীশপুর তাম্রশাসন, বুধগুপ্তের দামোদরপুর তাম্রশাসন ও পাহাড়পুর তাম্রশাসন, বৈন্যগুপ্তের গুনাইঘর তাম্রশাসন এর পাশাপাশি প্রাপ্ত গুপ্ত মুদ্রাগুলো থেকেও এ সময়ের ইতিহাস নির্মাণ করা যায়। এসব লিপিতাত্ত্বিক সূত্র থেকে সহজেই প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। এ সময়ের সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থা জানতেও গুপ্ত যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের উপর নির্ভর করতে হয়।

সমুদ্রগুপ্তের স্বর্ণমুদ্রা

বস্তুত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সময়েই সমগ্র বাংলায় গুপ্ত আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। সম্রাট প্রথম কুমারগুপ্ত, সম্রাট বুধগুপ্ত, সম্রাট বিষ্ণুগুপ্ত প্রমুখের তাম্রশাসনগুলো বাংলার গুপ্ত শাসন আমলের রাজনৈতিক ইতিহাস বিনির্মাণের কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছে। গুপ্ত শাসনামলে বাংলায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চূড়ান্ত বিকাশ লক্ষ করা যায়। একে সংস্কৃত ভাষা চর্চা ও সাহিত্যিক উন্নয়নের স্বর্ণযুগ হিসেবেও অভিহিত করা হয়। গুপ্ত আমলের গুপ্তব্রাহ্মী লিপির মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষা ফুটিয়ে তোলা হতো যা ইতিহাসের সূত্র হিসেবে টিকে আছে। এই সূত্রগুলো বিশ্লেষণ করে গুপ্ত যুগে বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামো সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা লাভ সম্ভব হয়েছে।

গুপ্ত-যুগের তাম্রশাসনগুলোতে ভূমি নিবন্ধন বিভাগ সম্পর্কিত তথ্যের সন্ধান মেলে। এক থেকে তিন জন করে ভূমি নিবন্ধনের বিশেষ কর্মকর্তা বা পুস্তপাল বিষয়পতির দপ্তরে কাজ করতেন। জমির অবস্থান ও প্রকৃতি, জমির সীমা, মালিকানা এবং মূল্যমান সম্পর্কিত তথ্যাদি সংরক্ষণ করাই ছিল তার কাজ। জমি ক্রয়-বিক্রয়ের নথি সংরক্ষণ করা এবং ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমোদনের বৈধতা নিশ্চিত করার কাজে তাঁর মতামত ছিল অগ্রগণ্য। সেইসাথে বিক্রিত ভূমির পরিমাপ ঠিক করে জরিপের মাধ্যমে সেই ভূমি হস্তান্তরের দায়িত্বও ছিল পুস্তপালের।

খ্রিস্টীয় ৪ থেকে ৭ শতক পর্যন্ত গুপ্ত সম্রাটরা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল শাসন করেন যে সময়ের বাংলার বিভিন্ন প্রত্নস্থল থেকে প্রচুর গুপ্ত-স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। গুপ্ত সম্রাটগণ কিছু রৌপ্যমুদ্রা জারি করলেও বাংলা অঞ্চলে তাদের রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা পাওয়া যায়নি বললেই চলে। কেবল ভারতের চন্দ্রকেতুগড় থেকে স্কন্ধ গুপ্তের সময়কালের একটি রৌপ্যমুদ্রা পাওয়ার কথা জানা যায়। বিশেষ করে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত থেকে বিষ্ণুগুপ্ত পর্যন্ত সকলেই স্বর্ণমুদ্রা জারি করেন যার প্রত্যেকটির নমুনা না পাওয়া গেলেও গুপ্তদের প্রায় অধিকাংশ স্বর্ণমুদ্রা বাংলা থেকে আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

প্রাচীন বাংলার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে গেলে ধারাবাহিকভাবে মৌর্য, শুঙ্গ, গুপ্ত ও কুষাণ আমলের বর্ণনার বিকল্প নেই। প্রাথমিকভাবে মহাস্থানগড় থেকে প্রাপ্ত একটি শিলালিপির ভিত্তিতে বাংলায় মৌর্য শাসনের অস্তিত্ব শনাক্ত করা গিয়েছে। একইভাবে মুদ্রা, শিলালিপি এবং তাম্রশাসন থেকে গুপ্ত ও কুষাণ যুগের প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্যদিকে বাংলার কয়েকটি এলাকা থেকে প্রাপ্ত পোড়ামাটির নিদর্শন বাংলার শুঙ্গযুগের প্রমাণ দিচ্ছে।

পাঠ-১.৪ স্বাধীন বঙ্গ রাজ্য, গৌড় ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা
Independent Vanga Kingdom, Gauda and South-East Bengal

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বঙ্গের তিনজন স্বাধীন রাজার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের নানা অর্জনের বিবরণ দিতে পারবেন;
- দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন।

স্বাধীন বঙ্গরাজ্য : গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব

প্রাথমিকভাবে সমতটে বৈন্যগুপ্তের পূর্বের কোনো রাজার নাম অদ্যাবধি জানা যায়নি। ফলে বৈন্যগুপ্তকেই গুপ্তোত্তর বাংলার প্রাচীনতম রাজা বলে মনে করা হয়। এ সময়ের ইতিহাস রচনার জন্য তাঁর গুনাইঘর তাম্রশাসনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরে রক্ষিত এই লিপিটি বর্তমান কুমিল্লা জেলার দেবীদ্বারের কাছাকাছি গুনাইঘর গ্রামে পাওয়া গেছে। লিপির ভাষ্য অনুযায়ী, মহারাজা বৈন্যগুপ্ত ক্রিপুরের বিজয় শিবির বা জয়স্কান্ধাবার থেকে ১৮৮ গুপ্তাব্দে তথা ৫০৮ খ্রিস্টাব্দে আশ্রম-বিহারে বসবাসরত বৈবর্তিক ভিক্ষু সংঘের ভোগ ব্যবহার, পূজা অর্চনা ও ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করা এবং বিহার-কাঠামোর সংস্কারের জন্য ১১ পাটক চাষযোগ্য ভূমি চিরতরে দান করেন। উল্লিখিত গুনাইঘর তাম্রশাসন ক্রিপুরের বিজয় স্মারকের পাশাপাশি বৈবর্তিক ভিক্ষু সংঘকে বৈন্যগুপ্তের ভূমিদানের দলিল যা ঐ সময়ের অনেকগুলো আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়কে নির্দেশ করছে। গুপ্ত যুগের পরেই জানা যায় স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের কথা।

ইতিহাসের আবর্তনে গুপ্ত শাসনের পরে (৬-৮ শতক) গৌড় ও বঙ্গে স্বাধীন রাজত্বের বিকাশ ঘটে। বিশেষ করে খ্রিস্টীয় ৬-৭ শতকের দিকে বাংলার শাসন কাঠামোতে স্বাধীন বঙ্গরাজ্য, গৌড় রাজ্য এবং সমতট রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। এসব রাজ্যের জারিকৃত ভূমিদানপত্র বা লিপি বিশ্লেষণ করে ঐ সময়ের ইতিহাস নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। এই সময়ের লিপিমালা ও মুদ্রায় একদিকে যেমন গুপ্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ছাপ রয়েছে, তেমনি স্থানীয় উপাদান ও প্রভাবযুক্ত হওয়ায় এগুলো নতুন মাত্রা পেয়েছে। এই সময়ের লিপিগুলোর মধ্যে তাম্রশাসনের প্রাধান্য রয়েছে যেখানে গুপ্তশৈলীর বিশেষ প্রভাব লক্ষ করা যায়।

মুদ্রা ও লিপিতাত্ত্বিক প্রমাণের আলোকে ধরা হয়, খ্রিস্টীয় ৬ শতকে স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের উদ্ভব ঘটে। মুদ্রা ও লিপিমালায় এ রাজ্যের তিনজন রাজার নাম জানা যায় গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব। বস্তুত তাঁরা ছিলেন বঙ্গের শক্তিশালী শাসক যাঁরা খুব সম্ভবত কোটালিপাড়া থেকে রাজ্য শাসন করতেন। বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া এলাকা থেকেই অধিকাংশ লিপি পাওয়া গেছে। অন্যদিকে গোপচন্দ্রের জয়রামপুর তাম্রশাসন পাওয়া গেছে উড়িষ্যায়, মল্লসারুল তাম্রশাসন পাওয়া গেছে পশ্চিমবঙ্গে যা থেকে স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। বিচ্ছিন্নভাবে প্রাপ্ত এসব তাম্রশাসন বিশ্লেষণ করে বাংলার স্বাধীন রাজা হিসেবে গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেবের ইতিহাস নির্মাণ করা সত্যিই দুরূহ। বিশেষ করে একটি সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে স্বাধীন বঙ্গরাজ্যকে বিচার করা প্রায় অসম্ভব।

গোপচন্দ্রের অধীনস্থ জনৈক মহারাজা বর্ধমান-ভুক্তির অন্তর্গত বক্কট্টকবীথির অধীনস্থ বেত্রগর্তা গ্রামের ৮ কুল্যবাপ জমি ক্রয় করে জনৈক ব্রাহ্মণ বৎস্যপাল স্বামীকে দান করেছিলেন বলে জানা যায়। এক কুল্যবাপ ভূমি বলতে বোঝানো হয়েছে সেই পরিমাণ ভূমিকে যেখানে এক কুলাভর্তি ধানের বীজ বপন করা যায়। অন্যদিকে ধর্মাদিত্যের কোটালিপাড়া থেকে প্রাপ্ত দুটি তাম্রশাসন এবং সমাচারদেবের গোগ্রাহাটি তাম্রশাসন একইভাবে বারকমণ্ডল বিষয়ের অফিস থেকেই জারি করা হয়েছিল। এখানে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে 'গজলক্ষ্মী সিল' উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সিলকে 'শ্রী লক্ষ্মী সিল' বা 'অভিষেক লক্ষ্মী সিল' বলেও ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের তাম্রশাসনে গুপ্ত ঐতিহ্যের প্রতিফলন থাকলেও পাঁচ শতকের বাংলার তুলনায় ছয় শতকের স্বাধীন বঙ্গ-রাজ্যের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

প্রশাসনিক স্তরবিন্যাস বিশ্লেষণ করে জানা যায়, গুপ্ত-যুগে কোটিবর্ষের পরিষদে নগরশ্রেষ্ঠী, স্বার্থবাহ, প্রথম কুলিক ও প্রথম কায়স্থের স্থান ছিল অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ। এদের মধ্যে প্রথমজন ধনাঢ্য বণিকের প্রতিনিধি, দ্বিতীয়জন আমদানি-রপ্তানিকারকদের প্রতিনিধি, তৃতীয়জন কারিগর-শিল্পীদের প্রতিনিধি বলে জানা যায়। পরিস্থিতির দায় মেটাতে গিয়ে এখানে ধনাঢ্য বণিকের স্থান দেওয়া হয়েছিল শীর্ষে। কিন্তু স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের বারকমণ্ডল নামক বিষয়-পরিষদের শীর্ষ ব্যক্তি ছিলেন জ্যেষ্ঠকায়স্থ বা মুখ্য সচিব যা একটি ব্যতিক্রম হিসেবেই পরিগণিত। এই পদটি ঐ সময়ের প্রশাসনিক স্তরবিন্যাসের প্রতি আলোকপাত করেছে। প্রশাসনিক কাঠামোর কার্যক্রম বিশ্লেষণে বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

গৌড়রাজ শশাঙ্ক

গুপ্ত রাজবংশের পতনের পর ধারাবাহিক ঘটনাপ্রবাহ শেষে একটি শক্তিশালী রাজবংশ হিসেবে পাল রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। গুপ্ত রাজবংশের শেষদিকে উত্তর বাংলার মহাসামন্ত শশাঙ্ক ক্রমশ শক্তিশালী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি তার অধীনে থাকা উত্তরবঙ্গ তথা গৌড়ের স্বাধীন নরপতি হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করেন। বিহারের রোটাসগড়ে একটা পাহাড়ের গায়ে প্রাপ্ত সিলে 'শ্রী শ্রী মহাসামন্ত শশাঙ্ক দেবস্য' কথামালা উৎকীর্ণ ছিল, যার অর্থ একজন মহাসামন্ত বা শাসক হিসেবে তিনি অত্যন্ত সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

স্বাধীন গৌড়রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর শশাঙ্ক খুব শক্তিশালী রাজা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। গুপ্তোত্তর কালের সম্রাট শশাঙ্ক গৌড়াধিপতি হিসেবে উত্তর ও পশ্চিম বাংলার বিশাল এলাকা জুড়ে তাঁর রাজ্য গড়ে তোলেন। পাশাপাশি মগধ বা দক্ষিণ বিহার, উৎকল ও কঙ্গোদ বা উত্তর উড়িষ্যার উপরেও তিনি আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে জানা গেছে। তিনি তার জীবদ্দশায় অনেক রাজ্য অধিকার করেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর যোগ্য উত্তরসূরীর অভাবে এসব রাজ্যের অনেকটাই আবার হাতছাড়া হয়ে যায়।

স্বাধীন বঙ্গ রাজ্যের অবসানের পর উত্তর ও পশ্চিম বাংলায় কর্ণসুবর্ণকে কেন্দ্র করে স্বাধীন গৌড় রাজ্যের উদ্ভব ঘটেছিল। এই সময়ের তথ্যপ্রমাণের অংশ হিসেবে গৌড়রাজ জয়নাগ ও শশাংকের লিপি আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। তৎকালীন কর্ণসুবর্ণরাজ জয়নাগের বপ্পঘোষবাট তাম্রশাসনের তথ্য পাওয়া গিয়েছে। অন্যদিকে গৌড়রাজ শশাংকের আমলে জারি করা তাম্রশাসনগুলো পাওয়া গেছে বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও উৎকল তথা উড়িষ্যা থেকে।

বিহারের রোটাসগড় দুর্গ-প্রাচীরে একটি সিলমোহরের ছাপ পাওয়া যায় যেখানে শশাংককে মহাসামন্ত বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, শশাংক প্রথম জীবনে একজন সামন্তরাজা ছিলেন। পরবর্তীকালে শশাঙ্ক স্বাধীন রাজা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। মেদিনীপুর তাম্রশাসন-১, মেদিনীপুর তাম্রশাসন-২ এবং এগরা তাম্রশাসন থেকে তার রাজত্বকালের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি পাওয়া যায়। তবে শশাংকের গঞ্জাম তাম্রশাসন সামন্তরাজা দ্বিতীয় মাধববর্মা জারি করেছিলেন। এর মাধ্যমেও সম্রাট শশাঙ্ক সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। শশাংকের তাম্রশাসনে গুপ্ত-ধারার প্রতিফলন থাকলেও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন চোখে পড়ে। বিশেষ করে তাঁর আমলে বাংলার সমাজ ও প্রশাসন অধিকতর সামন্ত-নির্ভর হয়ে পড়েছিল। তবে এসব তাম্রশাসনে সামন্ত, মহাসামন্ত, অগ্রহারীণ প্রভৃতি গুপ্ত লিপিতে নেই।

উল্লেখ্য, গুপ্ত যুগেই বাঙালি স্বাধীন রাজ্য গড়ার প্রত্যয়ে নিজেকে প্রস্তুত করতে শুরু করেছিল যার পূর্ণতা লক্ষ করা যায় শশাঙ্কের রাজত্বকালে। গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেবের সময়ের স্বাধীন বঙ্গরাজ্য একটি ধারাবাহিক ঘটনাপ্রবাহের ফসল। দাক্ষিণাত্যের চালুক্যরাজ কীর্তিবর্মনের হাতে বঙ্গ রাজ্যের স্বাধীনতার অবসানে সমতট অঞ্চলে ভদ্র, খড়গ, নাথ, রাত প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্যের উত্থান ঘটে। বস্তুত এরই ধারাবাহিকতায় ৬০৬ খ্রিষ্টাব্দে গুপ্ত অধিকৃত গৌড়কে স্বাধীন করে একটি শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাজা শশাঙ্ক।

উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের বিশাল জনপদ জুড়ে শশাঙ্ক গৌড় রাজ্য গড়ে তোলেন। এয়াড়াও তিনি মগধ বা দক্ষিণ বিহার এবং উৎকল তথা উড়িষ্যা অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেন। মেদিনীপুরও তাঁর দখলে চলে আসায় উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে শশাঙ্কের প্রভাব লক্ষ করা যায়। রোটাসগড়ের সিলটির পাশাপাশি কিছু তাম্রশাসন এবং সপ্তম খ্রিস্টাব্দে আগত চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙের বিবরণী ও বাণভট্টের লেখা হর্ষচরিত গ্রন্থ থেকেও রাজা শশাঙ্ক সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। অন্যদিকে শশাঙ্কের স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা তাঁর সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য দেয়। বৌদ্ধগ্রন্থ 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে' শশাঙ্ক সম্পর্কে কিছু তথ্যের উল্লেখ রয়েছে। মহাসামন্ত শশাঙ্ক গৌড়ের সিংহাসন দখল করে সামন্ত অধিপতির বদলে গৌড়ের স্বাধীন রাজা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন কর্ণসুবর্ণে যা বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ

এলাকায় অবস্থিত। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে এখানে আবিষ্কৃত রক্তমৃত্তিকা বিহার, তার কাছে অবস্থিত কানসোনা গ্রাম এখনো শশাঙ্কের স্মৃতিচিহ্নগুলো ধারণ করে আছে।

তবে গোঁড়া শৈব ধর্মানুসারী শশাঙ্ক বৌদ্ধ ধর্ম বিদ্বেষী ছিলেন যার প্রমাণ রয়েছে হিউয়েন সাং এর বিবরণীতে। তবে হিউয়েন শাং ব্যক্তিগতভাবে শশাঙ্ককে পছন্দ করতেন না। শশাঙ্কের শত্রু থানেশ্বরের রাজা হর্ষবর্ধন ছিলেন হিউয়েন সাঙের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক। অপর একজন বর্ণনাকারী বাণভট্টও ছিলেন শশাঙ্কের বিরোধী হর্ষবর্ধনের সভাকবি। তাই তাদের বিবরণের আলোকে শশাঙ্ককে সরাসরি বৌদ্ধদলনকারী হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায় না। তবে উগ্র শৈব মতাদর্শী শশাঙ্কের দ্বারা বৌদ্ধদলন অনেকটাই সম্ভব। সেন শাসনামলে নিম্নবর্ণের হিন্দু, বৌদ্ধ, বহিরাগত মুসলিম অপেক্ষা শৈব মতাদর্শী শশাঙ্কের বৌদ্ধ দলনের সম্ভাবনা আরো স্পষ্ট হয়।

সর্বভারতীয় মৌর্য ও গুপ্ত শাসনের অধীনে থেকে এদেশের মানুষের পক্ষে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সত্তার বিকাশ ঘটানো সম্ভব হয়নি। এই অবস্থার উত্তরণ ঘটে রাজা শশাঙ্কের মাধ্যমে। তিনি স্বাধীন গৌড়রাজ্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর মাধ্যমেই বাংলা জনপদে স্বাধীন রাজনৈতিন সত্তার উদ্ভব ঘটেছিল। কিন্তু হর্ষবর্ধন ও ভাস্কর বর্মনের মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের আক্রমণের মুখে এই স্বাধীনতা খুব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। তবে বাংলার ইতিহাসে পরাধীনতার শিকল ছিঁড়ে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথম কৃতিত্ব রাজা শশাঙ্কেরই।

নাথ ও রাত রাজবংশ

সমতট অঞ্চলের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সত্তার বিকাশ বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রথমত নাথ ও রাত রাজবংশের শাসন সম্পর্কে আলোকপাত করতে হয়। এই সময়ের ইতিহাস রচনার সূত্র হিসেবে লোকনাথের ত্রিপুরা তাম্রশাসন (কুমিল্লা-ত্রিপুরা অঞ্চল), মুরুণ্ডনাথের কালাপুর তাম্রশাসন (মৌলভীবাজার জেলা) এবং শ্রীধারণরাতের কৈলান তাম্রশাসনের (কুমিল্লা জেলা) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বি.এম মরিসন মনে করেন লোকনাথ ছিলেন ষষ্ঠ শতাব্দীর একজন শক্তিশালী রাজা যিনি সমতটেশ্বর রাত-রাজ্যের অংশবিশেষ দখল করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অন্যদিকে মুরুণ্ডনাথের কালাপুর তাম্রশাসনটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। উপরে উল্লেখিত তিনটি তাম্রশাসনই কুমারামাত্যের অফিস থেকে জারি করা হয়েছিল। এর পূর্বে বাংলার কোনো স্থানে প্রাপ্ত তাম্রশাসন *কুমারামাত্যাধিকরণ* থেকে জারি করা হয়নি। একইসাথে গুরুত্বের সাথে লক্ষণীয়, পরবর্তীকালে কুমারামাত্যাধিকরণ থেকে ভূমি-দানপত্র জারি করার ধারা বেশিদিন টেকেনি।

খড়্গ রাজবংশ

রাত রাজবংশের পর সমতটের রাজধানী দেবপর্বতের সিংহাসন দখল করে খড়্গবংশ। অনেক ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতাত্ত্বিক মনে করেন, সপ্তম শতকের দিকে অনেকটা নাথ-রাত রাজবংশের সমকালীন রাজবংশ হিসেবে খড়্গ রাজবংশের উত্থান ঘটে। নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও বি.এম মরিসন মনে করেন, নাথ ও রাত রাজাগণ ষষ্ঠ শতাব্দীর স্বাধীন শাসক ছিলেন এবং খড়্গ রাজবংশ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল সপ্তম শতাব্দীতে। তথ্যপ্রমাণের বিচারে এই মতই সবথেকে যুক্তিসঙ্গত বলে প্রতীয়মান হয়। বিশেষ করে রাতগণ স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে স্বনামে মুদ্রা জারি করেছিলেন।

খড়্গ আমলের তাম্রশাসনগুলোর ধ্রুপদী গুপ্ত-ধারা থেকে বেরিয়ে এসে পরবর্তীকালের পাল ও সেন ধারার সূচনাপর্ব নিশ্চিত করেছিল। এই আমলের আগে জারি করা প্রায় সকল তাম্রশাসনই অনুভূমিক এবং একপার্শ্বে অনুভূমিকভাবে সিল সংযুক্ত। পাশাপাশি উৎকীর্ণ লিপির সারিগুলোও ফলকের লম্বালম্বি দিকে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সাজিয়ে খোদাই করা হতো। এই ধারা গুপ্তযুগে শুরু হয় এবং উত্তর-পশ্চিম বাংলায় শশাংকের তাম্রশাসন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ ধারা থেকে বেরিয়ে এসে খড়্গরাজগণ এক নতুন ধারার সূত্রপাত ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। খড়্গরাজগণ তাম্রশাসনগুলো লম্বাভাবে রেখে বাম থেকে ডানে পর পর লাইন টেনে লিপি খোদাইয়ের নতুন ধারা প্রচলন করেন। এই ধারা পরবর্তীকালের রাজবংশগুলোর তাম্রশাসনেও অনুসৃত হয়।

দেব রাজবংশ

খড়্গ রাজবংশের পতনের পর দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় দেব রাজবংশের উত্থান ঘটে। দেব রাজবংশের চারজন বিখ্যাত রাজার নাম শ্রী শান্তিদেব, শ্রী বীরদেব, শ্রী আনন্দদেব ও শ্রী ভবদেব। সাত শতকের শেষ ভাগ থেকে আট শতকের প্রথমার্ধে (৭৫০-৮০০খ্রি.) দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ দেব রাজবংশের অধীনে শক্তিশালী রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তাদের রাজধানী ছিল বর্তমান লালমাই-ময়নামতি অঞ্চলের দেবপর্বত। ময়নামতির শালবন বিহার খনন করে এই রাজবংশের চারটি

তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। দেববংশের রাজারা প্রাথমিক যুগের পাল রাজাদের সমসাময়িক ছিলেন। পাল রাজারা ময়নামতি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। এর নিদর্শন শালবন বিহার, আনন্দ বিহার, ভোজ বিহার প্রভৃতির কথা বলা যায়। দেবরাজাদের মুদ্রা ও নামের সঙ্গে পরমসৌগত, পরমভট্টারক, পরমেশ্বর, মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি প্রত্যয় সংযুক্তি থেকে তাদের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

ময়নামতির ঐতিহ্য নিদর্শন

বৌদ্ধ ধর্মীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও পোড়ামাটির ফলক থেকে দেবপর্বত অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম-কেন্দ্রিক একটি সমৃদ্ধ জনবসতি গড়ে ওঠার বিষয়টি সুস্পষ্ট। তবে উপযুক্ত প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও খননের অভাবে ময়নামতি অঞ্চলের ধর্ম-নিরপেক্ষ বসতিগুলো এখনো শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। ধর্মনিরপেক্ষ নিদর্শনগুলো বেশি পরিমাণে শনাক্ত করা সম্ভব হলে ঐ সময়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেত। তবে প্রাপ্ত সূত্র থেকে জানা যায়, আনন্দদেব ছিলেন দেব রাজবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি প্রায় ৩৯ বছর দেবপর্বতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি পরমসৌগত, পরমেশ্বর, পরমভট্টারক ও মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেছিলেন বলে জানা যায়।

বাংলাদেশে বিকশিত বৌদ্ধ সংস্কৃতির সাথে দেব রাজবংশের ইতিহাস গুরুত্বের সাথে জড়িয়ে আছে। দেব রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি রাজকীয় মর্যাদা লাভ করেছিল। চন্দ্র ও পাল রাজাদের আমলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করায় বঙ্গ হয়ে উঠেছিল তৎকালীন বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। রাজা আনন্দদেবের আনন্দবিহার ও ভবদেবের সময় নির্মিত শালবন বিহার তথা ভবদেব মহাবিহার ঐ সময়ে বিকশিত বৌদ্ধ সংস্কৃতির কথা জানান দেয়। এই ধারা বরেন্দ্র ও মগধের শিল্প ও স্থাপত্যকলাকে প্রভাবিত করেছিল বলে অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষক মনে করেন। দেব রাজবংশের পতন সম্পর্কে তেমন কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি।

হরিকেল রাজত্ব

ময়নামতির আশেপাশের দেবপর্বতে দেব রাজবংশের পতনের পর অষ্টত থেকে দশম শতাব্দীতে দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গে হরিকেল রাজ্যের বিকাশ ঘটেছিল যা চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হরিকেল রাজ্যের তিনজন রাজার নাম জানা গেছে। তাঁরা হলেন, দেবাতিদেব, কান্তিদেব ও আত্মাকরদেব। বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে আবিষ্কৃত শ্রী কান্তি দেবের তাম্রশাসনে কান্তিদেব নামক একজন রাজার নাম পাওয়া যায়। তাম্রশাসনের ভাষ্য অনুযায়ী তিনি এ অঞ্চলের সার্বভৌম নরপতি ছিলেন। কান্তিদেব হরিকেলে রাজত্ব করতেন এবং তাঁর রাজধানীর নাম ছিল বর্ধমানপুর। কান্তিদেবের তাম্রশাসন থেকে তার পিতা ধনদত্ত ও পিতামহ ভদ্রদত্তের নাম জানা গেছে। পিতা ধনদত্ত কোনো এক শক্তিশালী রাজ্যের রাজকন্যা বিন্দুরতিকে বিয়ে করেছিলেন। তবে বংশের অপর দুই রাজা দেবাতিদেব ও আত্মকরদেব কান্তিদেবের মতো শক্তিশালী ছিলেন না।

চন্দ্র রাজবংশ

হরিকেল রাজ্যের পর দশম শতকের প্রথমভাগে দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গে উত্থান ঘটে শক্তিশালী চন্দ্র বংশের। তারা দোর্দণ্ড প্রতাপের সাথে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ শাসন করেছিলেন। চন্দ্র রাজবংশের পাঁচজন শক্তিশালী শাসক ত্রৈলক্যচন্দ্র, শ্রীচন্দ্র, কল্যাণচন্দ্র,

লড়হচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র প্রায় ১৫০ বছর দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা শাসন করেছিলেন। তবে এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন শ্রীচন্দ্র। ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে ১০৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাদের রাজত্বকালে অনেকগুলো লিপি ও তাম্রশাসন পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে তাদের রাজত্ব ও শাসন সম্পর্কিত ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায়। লিপি থেকে জানা গেছে, বঙ্গ এবং সমতটের বিশাল অংশ জুড়ে তাদের শাসনকার্য বিস্তৃত ছিল। এছাড়া বাংলার উত্তর-পূর্ব অংশ অর্থাৎ সিলেট পর্যন্ত তারা রাজ্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন বলে জানা যায়।

বর্তমান ঢাকার দক্ষিণে অবস্থিত মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুর ছিল চন্দ্র রাজাদের রাজধানী। চন্দ্র রাজবংশের শক্তি, সামর্থ্য এবং রাজ্যবিস্তার নীতি তাদেরকে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের পাল শাসকদের সমতুল্য করে তুলেছিল। চন্দ্রবংশের প্রতিষ্ঠাতা ত্রৈলোক্যচন্দ্রের মৃত্যুর পর সিংহাসন অলংকৃত করেন শ্রীচন্দ্র। অনেকগুলো যুদ্ধের সাফল্য শ্রীচন্দ্রকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন করে। তিনি পরমসৌগত, পরমেশ্বর, পরমভট্টারক ও মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেছিলেন। উত্তরাধিকারসূত্রে বঙ্গ-সমতটের বিশালাকৃতির ভূখণ্ডের অধিপতি হয়েছিলেন শ্রীচন্দ্র। অনেকগুলো যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে তিনি এই ভূখণ্ডের পরিধি বিস্তারের পাশাপাশি পূর্বতন সাম্রাজ্যকে আরো শক্তিশালী ও স্থায়ী করেছিলেন।

শ্রীচন্দের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কল্যাণচন্দ্র ক্ষমতায় আরোহণ করেন। এরপর ধীরে ধীরে চন্দ্র রাজবংশের ক্ষমতা ও প্রভাববলয় ছোট হয়ে আসতে শুরু করে। লড়হচন্দ্রের তাম্রশাসনে কল্যাণচন্দ্রের সাফল্য অর্জনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই লিপিতে গৌড়ের সাথে যুদ্ধেও কল্যাণচন্দ্রের বিজয়ের কথা বলা হয়। ইতিহাসবিদদের ধারণা, কল্যাণচন্দ্রের কাছে পরাজিত জনগোষ্ঠী আসামের কাছাকাছি কম্বোজরা হতে পারে। কল্যাণচন্দ্রের পর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন লড়হচন্দ্র। কয়েকটি তাম্রশাসন ও মূর্তিলিপি থেকে তার সম্পর্কে জানা যায়। তিনি ১০২০ থেকে ১০৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ২৫ বছর রাজত্ব করলেও তার সময় থেকে চন্দ্র বংশের পতন ঘটতে থাকে।

বর্ম রাজবংশ

দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে বর্মরাজাদের উত্থান ও ক্রমবিকাশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এগার শতকের শেষভাগে বঙ্গে বর্মরাজদের উত্থান ঘটেছিল বলে অনুমান করা হয়। সেন রাজাদের হাতে পরাজিত হওয়ার পূর্বে ১০৮০ থেকে ১১৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় বর্মরাজগণ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার অধীশ্বর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বর্মবংশের বিখ্যাত রাজা জাতবর্মা, হরিবর্মা, সামলবর্মা এবং ভোজবর্মা এই অঞ্চল শাসন করেন। বাংলাদেশে বর্মদের চারটি লিপি পাওয়া গেছে যা থেকে তাদের ইতিহাস পুনর্গঠন করা হয়ে থাকে। হরিবর্মার সামন্তসার তাম্রশাসন, সামলবর্মার বজ্রযোগিনী তাম্রশাসন, ভোজবর্মার বেলাব তাম্রশাসন ও ভট্টভবদেবের ভুবনেশ্বর শিলালিপির সাহায্যে বর্ম রাজাদের ইতিহাস রচনা করা হয়।

হরিবর্মার সামন্তসার তাম্রশাসনটি অনেকটাই অগ্নিদগ্ধ ও ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় আবিষ্কৃত হওয়াতে তা থেকে পূর্ণ তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে সামলবর্মার বজ্রযোগিনী তাম্রশাসনের খণ্ডিত অংশ পাওয়া গেছে। তাই ভোজবর্মার বেলাব তাম্রশাসন ও ভট্ট ভবদেরে ভুবনেশ্বর শিলালিপি থেকেই বর্মরাজাদের ইতিহাস রচনা ও পুনর্গঠন করার চেষ্টা করা হয়। তিনি বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে কলচুরি ও পাল বংশের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন বলে জানা যায়। বস্তুত এই মিত্রতার সূত্র ধরেই দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় পাল শাসন বিস্তৃতি লাভ করেছিল। তবে মহীপালের রাজত্বকালে ১০৭৫-১০৮০ খ্রিস্টাব্দে বরেন্দ্রে সামন্ত বিদ্রোহ দেখা যায়। কৈবর্তদের নেতা দিব্য ক্ষমতায় আরোহণ করার পর সুযোগ বুঝে জাতবর্মাও স্বাধীন হয়ে যান। এরপর বর্ম রাজবংশের সিংহাসন অলংকৃত করেন হরিবর্মা, সামলবর্মা ও ভোজবর্মা। ভোজবর্মার পর বর্ম রাজত্ব গ্রাস করে নেয় সেনরা। এর মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার স্বাধীন সত্তা বিলুপ্ত হয়েছিল।

সারসংক্ষেপ

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর বাংলায় কোনো কেন্দ্রীয় শাসন টিকে থাকেনি। এরপর বঙ্গ অঞ্চলে তিনজন শক্তিশালী রাজা হিসেবে গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য এবং সমাচারদেবের নাম পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে গৌড়ে উত্থান ঘটেছিল শক্তিশালী শাসক শশাঙ্কের। এর বিপরীতে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় ধীরে ধীরে বিকাশ ঘটে অনেকগুলো স্বাধীন রাজ্যের। এসব রাজ্যে নাথ ও রাত, খড়্গ, দেব, চন্দ্র ও বর্ম রাজবংশের শাসনকালের কথা শোনা যায়। প্রায় স্বাধীন রাজ্যের এসব রাজবংশের প্রায় প্রত্যেক শাসকের বিভিন্ন মুদ্রা ও তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে।

পাঠ-১.৫ পাল ও সেন শাসনামল
Pala and Sena Regime

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পাল রাজাদের রাজনৈতিক কার্যাবলির বিবরণ দিতে পারবেন;
- বাংলায় সেন শাসনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বাংলায় পাল ও সেন শাসনের তুলনামূলক বিবরণ দিতে পারবেন।

হুন আক্রমণে শক্তিশালী গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার পর বাংলার সভ্যতার ইতিহাসে একটি মারাত্মক অরাজকতার মুখে পড়ে। বস্তুত শতবর্ষব্যাপী অবক্ষয়ের অবসানে আনুমানিক অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা পুনরায় সংগঠিত হয়। পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল এই অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন পাল রাজবংশ। তবে গোপালের উত্থান ও পাল রাজবংশ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ কেনো তথ্য পাওয়া যায় না। এ সময়ের ইতিহাস রচনার জন্য বিভিন্ন লিপি-সূত্র, রাজপ্রশস্তি, তাম্রশাসনের সহায়তা নেওয়া হয়। ইতিহাসবিদদের অনুমান, খুব সম্ভবত ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে গোপাল জনগণের রাজা নির্বাচিত হয়েছিলেন। তবে অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে রাজশক্তির স্থায়িত্ব ও শক্তিশালী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলার ইতিহাসে এটি একটি যুগান্তকারী ঘটনা। পরবর্তীকালে অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে ধর্মপাল ও দেবপালের যোগ্য নেতৃত্ব এই সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত বিকাশের পথ সুগম করে। এরপর শক্তিশালী পাল রাজগণ প্রায় চারশ বছর ধরে বাংলা শাসন করেছিলেন। পরপর দুটি ত্রিপক্ষীয় সংঘর্ষে ধর্মপাল পরাজিত হলেও সে সময়ে বাংলার গৌরব পুরো ভারতবর্ষব্যাপী বিস্তৃত হয়েছিল।

পাল শাসনপর্বের গুরুত্ব

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে সুদীর্ঘ পাল শাসনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এ সময়ে স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থার কারণে শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যের বিপরীতে বাংলার রাজনৈতিক প্রভাববলয় বিস্তৃতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে পাল রাজত্বের কথা উল্লেখ করতে হয়। তবে দীর্ঘ সময়ে বিস্তৃত পাল রাজত্বের বিভিন্ন উত্থান-পতন চোখে পড়ে। উত্থান-পতন আর শক্তিমত্তার বিচারে বাংলায় পাল শাসনকে তিনটি পর্বে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা: ক) গোপাল কর্তৃক বাংলায় পাল বংশের প্রতিষ্ঠা থেকে পাল শাসনের উন্মেষপর্ব; খ) ধর্মপাল (আনুমানিক ৭৮১-৮২১ খ্রি.) ও দেবপালের (আনুমানিক ৮২১-৮৬১ খ্রি.) মাধ্যমে পাল রাজত্বের উত্থানপর্ব এবং গ) প্রথম মহীপালের (আনুমানিক ৯৯৫-১০৪৩ খ্রি.) নেতৃত্বে সাম্রাজ্যের পুনর্গঠন হলেও এসময় থেকেই পাল রাজত্বের গৌরবে ভাটা পড়ে। রামপালের (আনুমানিক ১০৮২-১১২৪ খ্রি.) উত্তরাধিকারীদের দুর্বল শাসনের যুগকে তাই পালদের ইতিহাসে অবনতি ও পতনের যুগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

ধর্মপাল ও ত্রি-পক্ষীয় সংঘর্ষ

পালদের উন্মেষপর্বে ধর্মপাল ও দেবপাল উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে সফল হস্তক্ষেপ করেছিলেন। বিশেষ করে বাংলায় দাপটের সাথে রাজত্ব করে প্রয়োজনীয় শক্তিও তারা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রাধান্য বিস্তারের এক পর্যায়ে পালবংশ উত্তর ভারতের সাম্রাজ্যগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর শক্তি ও সক্ষমতা অর্জন করে। অষ্টম শতকের শেষের দিকে উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দক্ষিণাত্যের চালুক্য-রাষ্ট্রকূট, মালব-রাজপুতনার গুর্জর প্রতিহার ও গৌড়-বরেন্দ্র-মগধ অঞ্চলের পালদের মধ্যে ত্রি-পক্ষীয় সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। এই সংঘর্ষে পালরাজ ধর্মপাল বার বার পরাজিত হলেও তার শক্তিমত্তা অটুট থাকে।

ত্রি-পক্ষীয় সংঘর্ষের প্রথমপর্বে ধর্মপাল তার শক্তি অক্ষত রেখেছিলেন। এ যুদ্ধের জয় পরাজয় অপেক্ষা কৌশলগত দিক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি আর নানাবিধ আর্থ-রাজনৈতিক কারণে প্রবল পরাক্রান্ত রাষ্ট্রকূট ও গুর্জর প্রতিহাররা অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ধর্মপাল তার খালিমপুর তাম্রশাসনে এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। খালিমপুর তাম্রশাসনের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি চোখের ইশারায় কান্যকুব্জে রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে আগত

ভোজ, মৎস, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গান্ধার ও কীরের রাজাগণ অবনত মস্তকে ধর্মপালকে সমর্থন দিয়েছিলেন। পাল শাসনামলের গুরুত্বপূর্ণ দলিল খালিমপুর তাম্রশাসন উৎকীর্ণ করা হয়েছিল ধর্মপালের ৩২ রাজ্যাঙ্কে। এ থেকে নিশ্চিত করা যায় ধর্মপাল কমপক্ষে ৩২ বছর বা আরো বেশি সময় রাজত্ব করেছিলেন। তিব্বতী ঐতিহাসিক লামা তারনাথের মতে ধর্মপাল ৬৪ বছর ক্ষমতায় ছিলেন। যদিও অন্য কোনো তথ্যপ্রমাণে এর প্রমাণ পাওয়া যায় না।

দেবপাল

ধর্মপালের মৃত্যুর পর তার পুত্র দেবট দেবপাল নাম ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। দেবপাল ক্ষমতায় বসে পিতা ধর্মপাল থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যে বিশাল রাজ্যলাভ করেছিলেন তা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে তার সময়ও পাল সাম্রাজ্যের গৌরব অটুট ছিল। দেবপালের নালন্দা ও মুঙ্গের তাম্রশাসন, নারায়ণ পালের বাদাল স্তম্ভলিপি ও ভাগলপুর তাম্রশাসন থেকে দেবপালের সময়ের ইতিহাস রচনা করা হয়। জানা যায়, তিনিও পিতার মতো ত্রি-পক্ষীয় সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তবে তিনি পিতা ধর্মপালের মতো পরাজিত হননি। দ্বিতীয় নাগভট্টের পর দুর্বল হয়ে পড়া গুর্জর প্রতিহার সাম্রাজ্য দেবপালের বিরুদ্ধে শক্তিশালী কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। অন্যদিকে দক্ষিণাত্যের সংঘাতের কারণে রাষ্ট্রকূট রাজা অমোঘবর্ষ অনেকটাই নিষ্ক্রিয় ছিলেন। ফলে দেবপাল অনেকটা নিরাপদেই তার শাসনকাজ পরিচালনা করতে পেরেছিলেন।

পালদের দুর্বলতা ও কৈবর্ত বিদ্রোহ

দেবপালের মৃত্যুর পর পাল রাজারা সামরিক শক্তিতে অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েন। ৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের পর বাংলার কিছু অংশ বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গ কম্বোজরাজ রাজ্যপালের অধীনে চলে যায়। এরপর ১০৭৫ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহী কৈবর্ত সম্প্রদায়ের সাথে সামন্তবর্গ একাত্মতা ঘোষণা করেন। তাঁরা উচ্চ-পদস্থ রাজকর্মচারী দিব্যের নেতৃত্বে অত্যাচারী পালরাজা দ্বিতীয় মহীপালকে পরাজিত করতে সক্ষম হন। বাংলার ইতিহাসে এই প্রতিরোধ 'কৈবর্ত বিদ্রোহ' হিসেবে পরিচিত। তবে পরবর্তীকালে মহীপালের ভাই রামপাল সামন্তবর্গের সহযোগিতায় পাল রাজত্ব পুনরুদ্ধার করেন। রামপাল গৌড়ের কাছে রামাবতী নামে একটি নগর গড়ে তোলেন এবং সেখানেই রাজধানী স্থাপন করেন। সন্ধ্যাকর নন্দি তাঁর *'রামচরিত কাব্যে'* রামাবতী নগরীর বিপুল ঐশ্বর্যের কথা বর্ণনা করেছেন। তবে রামপালের মৃত্যুর পর পাল রাজত্ব আর বেশি দিন টিকতে পারেনি। ১১৫৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এ সাম্রাজ্য অনেকটা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

পাল আমলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

পাল রাজাগণ বাংলা এবং বাংলার বাইরে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। শৈলেন্দ্ররাজ বালপুত্রদেব জাভা, সুমাত্রা, মালয় অঞ্চলে বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠার জন্য দেবপালের কাছ থেকে পাঁচটি গ্রাম লাভ করেছিলেন বলে প্রমাণ রয়েছে। অন্যদিকে ১ম মহীপালের সময়ও সারনাথ ও নালন্দায় ধর্মীয় স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপজেলার সীতাকোট বিহার পাল আমলে নির্মিত আরেকটি বৌদ্ধ ধর্মীয় নিদর্শন। এখানে প্রাপ্ত দুটি বৌদ্ধ ব্রোঞ্জমূর্তি বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি ও বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী থেকে বিহারটির সময়কাল ধরা হয় সপ্তম ও অষ্টম শতক।

সোমপুর মহাবিহার

পাহাড়পুরের কেন্দ্রীয় মন্দিরের অনুরূপ পোড়ামাটির ফলকের দেখা মিলেছে রংপুরের একটি মন্দিরে। মন্দিরটির ভূমি-পরিকল্পনা পাহাড়পুরের কেন্দ্রীয় মন্দির এর ভূমি-পরিকল্পনা থেকে কিছুটা ভিন্ন ধরনের। বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্কৃতির নিদর্শন হলেও এগুলোর সময়কাল সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গের দিনাজপুর জেলার বানগড়ে প্রাপ্ত নিদর্শন থেকে এই অঞ্চলে পাল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়।

বাংলায় সেন শাসনামল

বাংলার ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় একটি বহুলআলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ শাসনকাল হচ্ছে সেন শাসনামল। এগার শতকের শেষ দিকে আনুমানিক ১০৯৭ খ্রিস্টাব্দে সেনযুগের সূচনা। ১২০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় সেন শাসনামল স্থায়িত্ব লাভ করেছিল। সেন রাজারা বাংলার ভূমিপুত্র নয়। তাদের আগমন ঘটেছিল দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট বা কর্ণাটক রাজ্য থেকে। পাল এবং চন্দ্র রাজাদের সৈন্যবাহিনীতে চাকরির সুবাদে তাদের অনেকে এদেশে স্থায়িভাবে বসবাস করতে শুরু করে। একসময় শক্তি অর্জন করে তারা পুরো বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করে নেয়। পরবর্তীকালে তুর্কি সেনানায়ক বখতিয়ার খলজীর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত তাদের এই ক্ষমতা অক্ষুন্ন ছিল। সেনদের ক্ষমতায় আবির্ভাব নিয়ে অনেকগুলো মতামত প্রচলিত রয়েছে। অনেকে তাদের চন্দ্র রাজবংশজাত বলে দাবি করেছেন। তবে সেনদের ক্ষমতায় আবির্ভাব একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হয়েছিল। এখানে ধারাবাহিকভাবে বীরসেন, সামন্তসেন ও বিজয়সেনের ভূমিকাই মূখ্য। বিজয় সেনের দেওপাড়া প্রশস্তি, ব্যারাকপুর তাম্রাশাসন, বল্লাল সেনের নৈহাটি তাম্রশাসন, লক্ষণ সেনের তর্পণদীঘি তাম্রশাসন, গোবিন্দপুর তাম্রশাসন, আনুলিয়া তাম্রশাসন, কেশব সেনের ইদিলপুর ও মদনপুর তাম্রশাসনের পাশাপাশি বিশ্বরূপ সেনের কলকাতা সাহিত্য পরিষদ তাম্রশাসন থেকে সেনদের সম্পর্কে জানা গেছে।

বিজয় সেন

পাল রাজাদের দুর্বলতা ও চন্দ্র রাজাদের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সুযোগ নিয়ে বিজয় সেনের হাত ধরে গৌড় ও বঙ্গ জনপদে সেন শাসনপর্বের উত্থান ঘটে। পাল শাসনের অন্তিমকালে রামপালের পক্ষে যুদ্ধে অংশ নিয়ে বিজয় সেন দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের বর্মদের পরাজিত করেন। তিনি রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে এ অঞ্চলে নিজেদের প্রশাসনিক ভিত শক্ত করেন। পরবর্তীকালে তিনি উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে পালদের পরাজিত করে সেনবংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তর বিহার ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও বিজয় সেনের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। বিজয় সেনের পুত্র ও উত্তরাধিকারী বল্লাল সেন (১১৫৮-১১৭৯ খ্রি.), তাঁর পুত্র লক্ষ্মণ সেনের (১১৭৯-১২০৫ খ্রি.) সেনাপতিত্বে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ এবং বঙ্গরাজ্য তাঁর দখলে আনেন। বঙ্গরাজ্য অধীনে আসার পর বিজয়সেন দেওপাড়ার প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দির নির্মাণ করেন।

ধীরে ধীরে সমগ্র অঞ্চল সেন রাজবংশের প্রভাব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কামরূপ রাজাকে পরাজিত কওে বিজয়সেন সেখানেও তার রাজত্ব কায়েম করেন। কলিঙ্গরাজকে পরাজিত করার পাশাপাশি তিনি গৌড়রাজ্যেও আধিপত্য বিস্তার করেন। ফলে বিজয়সেন ক্রমশ একজন শক্তিশালী রাজা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। পর্যায়ক্রমে নান্য, রাঘব, বীর ও বর্ধনকে পরাজিত করে তিনি সমগ্র এলাকায় তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর কৌশম্বীর রাজা দৌরপবর্ধন বা দ্বোরপবর্ধনকে পরাজিত করেন বিজয়সেন। উড়িষ্যার রাজা চোড়গঙ্গের পুত্র রাঘবও বিজয় সেনের কাছে পরাজিত হন। ধীরে ধীরে বাংলার পাল ও বর্মণ শাসনের অবসান ঘটিয়ে বিজয়সেন বাংলায় সেন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বাংলার উপর বহিঃশক্তির আক্রমণ প্রতিরোধ করতেও সক্ষম হয়েছিলেন।

তবে সেনদের ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে গেলে বিজয়সেন, বল্লালসেন ও তার পুত্র লক্ষণ সেনের ধারাবাহিক সফলতার কথা বলতে হয়। বল্লালসেন যেমন বিজয়সেনের প্রায় প্রতিটি যুদ্ধযাত্রার সঙ্গী ছিলেন তেমনি লক্ষণসেনও তার পিতা বল্লালসেনের আমলে অনেকগুলো যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। তাম্রশাসন থেকে জানা যায়, লক্ষণসেন কোটাটবীর রাজা বীরগুণ তথা বীরকে পরাজিত করেছিলেন। রামপালের সামন্তরাজা বীরগুণ বাঁকুড়া অঞ্চলে রাজত্ব করতেন।

বল্লাল সেন

বিজয় সেনের পর তাঁর পুত্র বল্লাল সেন (১১৬০-১১৭৮ খ্রি.) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সেনদের বিশাল সাম্রাজ্যের ঐক্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। বল্লাল সেন ও তাঁর পুত্র লক্ষ্মণ সেন গৌড়, কামরূপ, কলিঙ্গ ও কাশিতে অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি পুরি, বেনারস ও এলাহাবাদ দখলের মাধ্যমে সেখানেও সেন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এলাহাবাদ ও বেনারসে

বল্লাল সেনের অভিযান থেকে কাশীর গাড়হবালদের সঙ্গে সেন শাসকদের প্রতিষ্ঠার লড়াই ও দ্বন্দ্ব সম্পর্কে নিশ্চিত করে জানা যায়। পিতা বিজয়সেনের প্রায় প্রতিটি বিজয় অভিযানের সাথী বল্লাল সেন রাজ্যজয়ের পাশাপাশি সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। তিনি চালুক্য রাজকন্যা রামাদেবীকে বিয়ে করেন। সনোখর প্রতিমালিপি, নৈহাটি তাম্রশাসন, আনন্দভট্টরচিত বল্লালচরিত, বল্লালসেন রচিত অদ্ভুদসাগর ও দানসাগর থেকে বল্লালসেন ও তাঁর শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। শাসক হিসেবে তিনি অধিরাজ নিঃশংক শংকর ও গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণ করেছিলেন।

শাসক হিসেবে শক্তিশালী হওয়ার পাশাপাশি কবি ও পণ্ডিত হিসেবেও বল্লাল সেনের খ্যাতি ছিল। তিনি পাঁচটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ব্রতসাগর, আচারসাগর ও প্রতিষ্ঠাসাগর। তবে অদ্ভুদসাগর এর রচনাকাজ তিনি জীবদ্দশায় শেষ করতে পারেননি। পরে তাঁর পুত্র লক্ষ্মণ সেন এর কাজ শেষ করেন। কিন্তু অদ্ভুদসাগর ও দানসাগর বাদে অন্য তিনটি গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। পিতা বিজয়সেনের মতো শিবের উপাসক বল্লাল সেন গোঁড়া ধর্মবিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে পরম মহেশ্বর উপাধি ধারণ করেন। বঙ্গীয় কুলজি গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী বল্লাল সেন কৌলিণ্য প্রথার বিস্তার ঘটিয়েছিলেন। বল্লাল সেনের সময় বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম অনেক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করায় সমাজে নতুন করে শ্রেণিভেদ প্রথার শেকড় গ্রোথিত হয়। উচ্চশ্রেণির ব্রাহ্মণরা নিম্নশ্রেণির মানুষকে ধর্মীয় আধিপত্যের দোহাই দিয়ে বিভিন্ন নিয়মনীতি ও আইন কানুনের শিকলে বেঁধে ফেলে। তারা নিম্নবর্ণের জনগোষ্ঠীকে শোষণ ও অত্যাচার শুরু করে। শেষ জীবনে সিংহাসন ত্যাগ করে পুত্র লক্ষ্মণ সেনকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে বল্লালসেন নির্জনপুর চলে যান। হুগলির ত্রিবেণীর কাছে অবস্থিত গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমস্থলের এই নির্জরপুরে তিনি বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস-জীবন গ্রহণ করে আত্মবিসর্জন দিয়েছিলেন।

লক্ষ্মণ সেন

বল্লাল সেনের পর বাংলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন লক্ষ্মণ সেন। পিতার যোগ্য উত্তরসূরী লক্ষণ সেনের দক্ষতা ও রণকৌশলের গুণেই সেন রাজত্ব উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল। আবার এই লক্ষণ সেনের শাসনামলেই সেন শাসনামলের পতন ঘটে। প্রচলিত ইতিহাসে লক্ষণ সেনকেই সেন বংশের শেষ রাজা হিসেবে অভিহিত করা হয়। কিন্তু সেন বংশের শেষ রাজা হচ্ছেন লক্ষ্মণ সেনের পুত্র কেশব সেন। বস্তুত লক্ষ্মণ সেনের পরাজয়ের ফলে সেন সাম্রাজ্য বিক্রমপুর তথা বঙ্গ-সমতটে সীমিত হয়ে পড়ে। লক্ষ্মণ সেনের গোবিন্দপুর তাম্রলিপি, তর্পণদীঘি তাম্রলিপি, বকুলতলা লিপি, আনুলিয়া লিপি, ঢাকা প্রতিমালিপি, শক্তিপুর লিপি, ভাওয়াল তাম্রলিপি, মাধাইনগর তাম্রলিপি ও তার সভাকবিদের রচিত শ্লোক থেকে লক্ষণ সেন ও তার রাজত্ব সম্পর্কে জানা যায়।

লক্ষ্মণ সেন ৬০ বছর বয়সে যখন ক্ষমতায় আসীন হন তখন তাঁর পক্ষে নতুন করে কিছু অর্জন করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। তিনি পিতামহের আমলে গৌড় বিজয়ে অংশ নিয়ে কৃতিত্বের দাবীদার হন। তিনি প্রাগজ্যোতিষকে তার অনুগত রাজ্যে পরিণত করেন। মাধাইনগর ও ভাওয়াল লিপি থেকে জানা যায়, লক্ষণ সেন কলিঙ্গে সফল অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। এর পাশাপাশি কাশি, চেদি ও ম্লেচ্ছদের সাথে যুদ্ধ করে সফল হয়েছিলেন লক্ষণ সেন। তবে ১১৯৬ সালের দিকে সুন্দরবনের ডোম্মনপাল স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। লক্ষণ সেন তাকে দমন করতে পারেননি।

পরিশেষে বলা যায়, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শাসকদের দ্বারা বাংলাদেশ নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কারণে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও বিকাশ ত্বরান্বিত হয়েছে। বিশেষ করে, নানা ধরনের কৃষ্টির আত্মীকরণ, মিশ্রণ, অভিযোজন, একীভবন, স্বাচ্ছন্দ্যবিধান, প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে বাংলাদেশের সংস্কৃতির ব্যপক সমন্বয় ও বিকাশ ঘটেছে। সংস্কৃতির এ সমন্বয় ও বিকাশ প্রাক-ইতিহাস থেকে শুরু করে সমসাময়িক সমাজ বিবর্তনে বড় ধরনের অবদান বলে প্রতীয়মান হয়। পাশাপাশি ভৌগোলিক বিন্যাস, রাজ্যজয়, অবকাঠামোর উন্নয়ন, শাসন ব্যবস্থায় নানা ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এ এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রতিফলন ঘটে এ অঞ্চলের বিভিন্ন রাজার রাজত্বকালে।

সারসংক্ষেপ

প্রাচীন বাংলার সর্বশেষ দুটি শক্তিশালী রাজবংশ হিসেবে পাল ও সেনদের নাম বলা যায়। গোপাল পাল শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ধর্মপাল ত্রিপক্ষ সংঘর্ষের সময় নিজ যোগ্যতায় ভারতবর্ষের অন্যতম শক্তিশালী রাজা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। অন্যদিকে মুসলিম অধিকারের পূর্বে সেন বংশের তিনজন বিখ্যাত রাজা বিজয় সেন, বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন বাংলায় শাসন করেছেন। পাল শাসনামলে বৌদ্ধধর্ম পৃষ্ঠপোষকতা পেলেও সেনামলে হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যবাদকে উৎসাহিত করা হয়েছিল। তবে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস চর্চায় ঐতিহাসিকগণ প্রামাণ্য-তথ্যের অভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, তাম্রশাসন, মুদ্রা, লিপি বাংলার প্রাচীন ইতিহাস চর্চার প্রধান নিয়ামক হিসেবে বিবেচিত।

ইউনিট মূল্যায়ন

১. প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশ সম্পর্কে বর্ণনা করুন।
(Describe about the Geographic Location and Enviroment of Ancient Bengal.)

২. বাংলাদেশের প্রাগিতিহাসের উপর একটি নিবন্ধ লিখুন।
(Write an essay on Bangladesh Prehistory.)

৩. প্রাচীন বাংলার জনপদের বর্ণনা দিন।
(Describe about the ancient Bengal Janapada.)

৪. পাল যুগের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বর্ণনা দিন।
(Describe the cultural heritage of Pala Bengal.)

৫. শাসক হিসেবে ধর্মপালের কৃতিত্বের মূল্যায়ন করুন।
(Asses the achievements of Dharma Pala as a ruler.)

৬. সেন বংশের উত্থান-পতনের বিবরণ দিন।
(Describe the raise and fall of Sena regime.)

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মাৎসন্যায় কি? (What is Matsannayam?)

২. গোপাল কে ছিলেন? (Who was Gopala?)

৩. শ্রী-চন্দ্র কে ছিলেন? (Who was Shreechandra?)

৪. নাথ কারা? (Who were Natha?)

৫. সোমপুর মহাবিহার কি? (What is Sompura Mahavihara?)